মালদা জেলার গম্ভীরা চর্চা

রোকেয়া পারভীন

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা। এর মধ্যে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয় কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে ও সৃষ্টির আনন্দে গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তা ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে পরিচিত। একক মানুষ এর সৃষ্টি করলেও সমগ্র সমাজ যখন এই সাহিত্যকে মেনে নেয়, তখনই তা বংশপরম্পরায় বয়ে চলে। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লিবাসীরা স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভর করে এর লালন করে। সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করায় লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করা হয়। এই লোকসাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় রচনাকারের নাম পাওয়া যায় না। তবে কিছু বিভাগে রচনাকারের নাম পাওয়া যায়। কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন, ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার অভাব থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রস ও আনন্দবোধের অভাব থাকে না। লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসংগীত, গীতিকা, লোককাহিনি, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়। আর লোকনাট্যের একটি শাখা হল গম্ভীরা। আমার আলোচ্য বিষয় মালদা জেলার গম্ভীরাচর্চা।

মালদা জেলার অন্যতম লোকসংস্কৃতি বা উৎসব গম্ভীরা; যা একান্তভাবেই মালদার এবং বর্তমানে এই জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গম্ভীরার ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। অন্ত্যজ গ্রামীণ মানুষরা দারিদ্র্যকে জয় করে এই গান গায়। অনেকে আবার গম্ভীরাকে পালা বা গান হিসাবে মনে করে। তবে এই গানসহ সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান, পুজোপার্বণ গম্ভীরা উৎসবেরই অঙ্গ। অনেক স্থানে এই গানের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

তবে প্রাচীনকালে চণ্ডীমন্ডপের ন্যায় গৃহকে গম্ভীরা বলা হতো। আর সেখানেই সমস্ত আচার, পুজো, উৎসব, নৃত্য করা হয় বলে এই উৎসবকে গম্ভীরা বলে অভিহিত করা হয়। তাই 'গম্ভীরা' শব্দের প্রকৃত অর্থ দেবদূত আরাধনা বা ধর্মসংক্রান্ত কোনো গৃহকেই বোঝায়। মালদা, রংপুর, দিনাজপুরে 'গম্ভীরা' শব্দের এই অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলে যে গাজন উৎসব, তা মালদায় আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তা গম্ভীরা নামে পরিচিত। গম্ভীরা উৎসব হর-পার্বতীর পূজানুষ্ঠান। সূর্যপুজো, ধর্মপুজো, শৈবপুজো-মহাদেবের মধ্যে দিয়ে তা শিবপুজোয় পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে হরিদাস পালিত তাঁর

'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থে বলেছেন—

> গম্ভীরা যখন শিব-মন্দির ও দেবস্থান বুঝাইতেছে, তখন শিবাদির পূজা গম্ভীরাতেই হইত। শিবোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইত। এদেশের লোকে গম্ভীরায় শিবের পূজা করিত। কালক্রমে গম্ভীরার শিবোৎসব গম্ভীরা পূজা নামে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।[১]

গম্ভীরা মূলত রাজবংশী, চাঁই, কোচ, মাহালী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি জনপ্রিয়। প্রথম পর্যায়ে নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে গম্ভীরার প্রচলন থাকলেও পরবর্তীতে উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। গম্ভীরা মূলত চৈত্র মাসে চারদিন ধরে হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও তিনদিন বা সাতদিনও হয়ে থাকে। চৈত্র মাস ছাড়াও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এমনকি শ্রাবণ মাসেও এই পুজো হয়। এই গম্ভীরা উৎসবের কয়েকটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এই উৎসব বা গান চড়ক পুজোর চারদিন আগে থেকে শুরু হয়। চৈত্র মাস যদি ত্রিশ দিনে হয় অর্থাৎ, সংক্রান্তি ত্রিশ তারিখে হইলে ২৬ তারিখে গম্ভীরার 'ঘটভরা', ২৭ 'ছোটতামাসা', ২৮ 'বড়তামাসা', ২৯ 'আহারা' এবং ৩০ চড়ক পূজা হয়ে থাকে।[২]

প্রথম দিন—ঘটভরা : এটি সাধারণত ছোটোতামাসার আগেরদিন করা হয়ে থাকে। তবে সব জায়গায় সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। অঞ্চল বিশেষে নিজেদের প্রথানুসারে কোথাও নয়দিন, আবার কোথাও তিনদিন আগে ঘট স্থাপন করা হয়। প্রধান ভক্ত তথা মূল সন্ন্যাসী গম্ভীরা পুজোর উপকরণ জোগাড়ে সাহায্য করেন এবং প্রথানুসারে নিয়ম পালন করেন। ঘট স্থাপনের দিন থেকে গম্ভীরা গৃহে প্রদীপ জ্বালানো হয়। এক-একটি গম্ভীরা এক একটি মণ্ডলের অধীনে থাকে। মণ্ডল ছাড়া কোনো গম্ভীরা দেখা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির গম্ভীরার মণ্ডল বা মোড়ল থাকলেও সকল জাতির একটি আদি গম্ভীরা বর্তমান—যা ছত্রিশী গম্ভীরা নামে পরিচিত। এই গম্ভীরায় সব মণ্ডলের একজনমাত্র মূল মণ্ডল থাকেন। ঘট ভরার দিন মণ্ডলের নির্দেশে একটি সভা ডাকা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঘট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মণ্ডল সব শেষে অনুমতি প্রদান করলে সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণ চিরন্তন প্রথানুসারে ঢাক-বাদ্য সহকারে কাছে অবস্থিত কোনো নির্দিষ্ট জলাশয় থেকে ঘটে জল ভর্তি করে শাস্ত্রমতে গম্ভীরার গৃহে সেই ঘটস্থাপন করেন। এইদিন আর কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

দ্বিতীয়দিন—ছোটোতামাসা : ছোটোতামাসার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরার সূচনা হয়ে থাকে। সেই দিনই হর-পার্বতীর পুজো হয়। যারা শিবের কাছে মনোবাসনা পূরণের জন্য মানত করে, তারা 'ভক্ত' নামে পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালকরাই এই ভক্ত শ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে বলে তাদেরকে 'বালাভক্ত' বলে। ছোটোতামাসা ও বড়োতামাসার সন্ধ্যায় ভক্তরা গম্ভীরা মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে প্রধান ভক্তের নির্দেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বন্দনার এক একটি অংশ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই পা সামনে এগিয়ে আবার পেছনে ফিরে আসে। শিবগড়ার অনেক বন্দনা গাওয়া হয়। যেমন মালদার ধানতলার শিবগড়ার বন্দনা—

> কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি।
> আহার নাই, পানি নাই আস নিতি নিতি॥
> জল নাই, স্থল নাই সকল শূন্যাকার।
> কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার॥[৩]

দিনের তৃতীয় প্রহরে শোভাযাত্রা বের হয়। গম্ভীরা উৎসবের একেবারে শেষলগ্নে যে সংগীত অনুষ্ঠান হয়, তার নাম বোলবাহি। এই গান গম্ভীরা প্রাঙ্গণে গাওয়া হয় বলে এটি গম্ভীরা নামে পরিচিত।

গম্ভীরার গান মূলত মৌখিক ধারার গান। এর কোনো লিখিত দলিল পাওয়া যায় না। মূলত সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই গম্ভীরা গান বাঁধা হয় এবং তার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্ধকারময় ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরা হয়। এই গান ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হয়ে সমাজকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করে। শিবকে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দলের প্রতিনিধি মনে করে নিম্নবর্গীয়রা নিজেদের অভাব, অভিযোগ জানায় এবং সুরাহার দাবি করে। সমাজের মানুষের দৈন্য অবস্থা, অত্যাচারী রাজশক্তি বা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসে থাকা ব্যক্তিদের কথা, তাদের প্রতি ব্যঙ্গ এবং সমাজের অকল্যাণকারী নানা চরিত্রকে তুলে ধরাই এই গানের উদ্দেশ্য। যেমন—

চাচা জান বাঁচা দায় হল, বানে শহর যায় ভ্যায়সা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগছে দুয়ারে বইস্যা।[৫]

এই গানের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষরা সারাবছর ধরেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। দুঃখই যেন তাদের জীবনের নিয়তি। ফলে দুঃখকে তারা সঙ্গী করেই লড়াই করে বেঁচে থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসকারী শহরের বাবুরাও রেহাই পাননি। গানের এই চিত্র তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে বাবুদের নিয়ে মশকরা করা হয়েছে। গরিবদের দুর্দশার চিত্র দেখা যায় আরেকটি গানে—

শুন হে ভোলা নানা,
দেশবাসী তালকানা।
ছাই পড়িল মোদের ভাতে,
শিব হে এবার যেতে হবে,
মৃত্যুর পথে।[৬]

সুবিধাভোগী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আদর্শহীনতা, স্বার্থপরতা, নীচ মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গম্ভীরা গানের মধ্যে দিয়ে। এতে সামাজিক মানুষ অনেকটা সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়। সেই ভণ্ড, আদর্শহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চিত্র—

হামি করি ছাতা পার্টি,
বর্তমানে সবচেয়ে খাঁটি।
যেদিকে জলের ছাঁট,
ঘুরাই ছাতার বাঁট।
এটায় হামার রাজনীতি।[৭]

এছাড়াও অনেক গান রয়েছে—যেখানে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের অনেক চিত্র, দুর্দশা, ইংরেজদের অত্যাচার, বিশ্বযুদ্ধ মানুষের দুরাবস্থা ইত্যাদি সমসাময়িক জীবনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়।

গম্ভীরা কেবল উৎসব নয়, সমাজের সংস্কারক, চালক ও রক্ষক। সমাজের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হয়ে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যেও এক গঠনমূলক শিক্ষা লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে সকল

মানুষ স্বতন্ত্র হলেও সামাজিক জীব হিসাবে এক মেলবন্ধনের সুর বিরাজ করে। কারও আত্মপাপ গম্ভীরা নীরবে সহ্য করে না। গানের মধ্য দিয়ে তা জনসমক্ষে হাজির করে। গম্ভীরায় রাজনীতি বিদ্যমান। উৎসবকর্ম পরিচালনার জন্য অনেক কর্মবীরের আবির্ভাব হয় এবং দলপতির অধীনে থেকে সুষ্ঠভাবে কাজ সমাধা করে। এই গম্ভীরার মাধ্যমেই মাঙ্গালিক পদ্ধতির প্রচলন ও পঞ্চায়তি প্রথার বিকাশ হয়েছে বলে মনে হয়। এই গানে ধর্মীয় বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রতিফলিত। আর এই সবের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে। গ্রাম্য অশিক্ষিত কবিদের হৃদয় থেকে গানগুলি নিঃসৃত হয়ে জনগণের হৃদয়কে প্রেম, ভক্তি ও কবিত্বের স্রোতে মগ্ন করে। এপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা কৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরায় গীত কর্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। তাঁহাদেরকে বুঝতে হবে যে গম্ভীরায় কেবল এক পাড়ায় তিনদিন আমোদ প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙালি জাতির কাজ হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি চিন্তাশক্তি, বাঙালি সভ্যতা, বাঙালি আদর্শ প্রস্তুত করবার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।[৮]

তথ্যের সন্ধানে

১. ড. ফনী পাল সম্পাদিত : 'হরিদাস পালিত', আদ্যের গম্ভীরা, বলাকা, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৩১
২. তদেব : পৃ. ৩৭
৩. তদেব : পৃ. ৩৭
৪. তদেব : পৃ. ৪৮
৫. প্রদ্যোত ঘোষ : রচয়িতা ও শিল্পী, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৯৯
৬. তদেব : পৃ. ৯৯
৭. বিপ্লব চক্রবর্তী : 'মালদা জেলার থিয়েটারচর্চায় গম্ভীরা', তবু প্রয়াস, নদীয়া, আগষ্ট ২০১৮, পৃ. ১৫
৮. ড. ফনী পাল সম্পাদনা : 'হরিদাস পালিত', আদ্যের গম্ভীরা, বলাকা, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৮৩